মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা (পর্ব-২)

শাহেদ আলী

প্রথম পর্বঃ মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা

পাশ্চাত্যের বহু দার্শনিক আজকাল মনে করেন পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার অধঃপতন ঘটেছে, কারণ এ শিক্ষায় জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে-পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু বিভাগে। জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার জন্যেই একেকটি পৃথক স্বতন্ত্র কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। কক্ষগুলির দরজা-জানালা নেই, ফলে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। একটা বিশ্ব দৃষ্টি সৃষ্টি করার জন্যে জ্ঞানের সমগ্র ঐশ্বর্যকে এ শিক্ষা-ব্যবস্থা সুসমন্বিত এবং সুসংহত করার চেষ্টা করে না। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। যে ব্যক্তি এ ধরণের শিক্ষা পদ্ধতিতে মানুষ হয়েছে তার কাছে বিশ্বজগত কতগুলি খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশরূপে প্রতিভাত হয়। এইসব সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলির পশ্চাতে কোনো ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে না। দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডত্বের কারণে সুশিক্ষিত হয়েও জীবনের মৌল এবং সিরিয়াস মমস্যাগুলিকে সে সবের সত্যিকার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে সে সক্ষম হয় না। জীবনের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার জন্যে সাহস এবং সঠিক দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন থাকে না বলে সে জাগতিক সাফল্যের মধ্যেও মানসিক অবলম্বনহীনতায় পীড়িত হতে থাকে। শিক্ষায় উদ্দেশ্যহীনতা, মহত্তর আদর্শ ও মূল্যের অভাব, শিক্ষার্থীর মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে মানসিক নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দেয়। সে ক্রমে ক্রমে তার নিজের এবং তার সমাজের অস্তিত্বের মৌলিক নীতিগুলির অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি কেবল যে উদাসীন হয়ে পড়ে তা নয়, এ উপলব্ধির ক্ষমতাই সে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে। সে তার নিজের প্রকৃতির সংগেই নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জীবন তার কাছে আর আশীর্বাদ বলে মনে হয় না, বরং এ যেন একটা শাস্তি, অভিশাপ।

বলা বাহুল্য, এ জাতীয় শিক্ষা সংহত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির সহায়তা করে না-আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং নিয়মানুবর্তিতা যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। জীবনকে অর্থপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্যে এই সংহত ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য। কিন্তু আজকের শিক্ষা একদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

> তারা আজকের সভ্যতা, বিজ্ঞান এবং গবেষণার অগ্রগতিতে গর্বিত। কিন্তু বিজ্ঞান এবং গবেষণা যেহেতু মানবিক মূল্যবোধ এবং উচ্চতর আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত, এ কারণে এই সভ্যতাও মানবিক মূল্যবোধ এবং উচ্চতর আনুগত্য হারিয়ে মানুষের বিনষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এবং গবেষণা আত্মিক শিকড় এবং নোংগর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। আজকের নর-নারী আর নিজেদের প্রতি আস্থাশীল নয়, তাদের সামনে কোন দিশা নেই, কোন দিকে তারা আগাবে বা তাদের আগানো উচিত, এ সম্পর্ক তাদের কোন ধারণা নেই। উচ্চতর মূল্যবোধ এবং বাধ্যতামূলক প্রায়োরিটি বলে কিছু তাদের সামনে নেই। আমরা জীবনব্যাপী স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়া-শোনা করি কিন্তু আমরা জানি না, আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে গড়ে তোলার জন্যে আমাদের সত্যিকার প্রয়োজন কি, করণীয় কি। আজীবন অধ্যয়ন করে কেবল শূন্যতা এবং বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে, যে পথে চললে এ জীবন অর্থবহ হবে সে পথকে আলাকিত করে না, জীবনের লক্ষ সম্পর্কে চরম অনিশ্চয়তাই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার তিক্ত ফল।

মুসলিম দেশগুলিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত তাদের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় শিক্ষিত, তারা তাদের উচ্চতর শিক্ষা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়গুলোতে। সকল প্রকার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা অথবা বিতৃষ্ণাই এইসব বিদ্যায়তনের মৌলিক দর্শন হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের এসব পণ্ডিতের মগজ পশ্চিমের বিদ্যায়তনগুলোতে এমনভাবে ধোলাই করা হয় যে, তারা ঐসব প্রতিষ্ঠান তাদেরকে যা শিখায় তার বাইরে কিছু ভাবতে, অনুমান করতে পারেন না। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে সুযোগ ছাত্র হিসাবে দেশে ফিরে এসে তারা নিজ নিজ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি প্রর্বতন ও তাকে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের নিজস্ব জীবনাদর্শ এবং মূল্যগুলোর ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষানীতি র্নিধারণের কোন প্রস্তাব যখন তোলা হয় তখন এইসব শিক্ষাবিদদের অনেকেই তার ঘোর বিরোধিতা করেন এই বলে যে, এ ধরনের চেষ্টা প্রগতি বিরোধী এবং পশ্চাতমুখী।

এদের অনেকেই ধর্মে আস্থাশীল থাকেন না, অনেকে মনে করেন ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর সংগে শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন সম্পর্কে নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের ইসলামে বিশ্বাস প্রবল এবং ইসলামী সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অনুকূলে যারা উচ্চকণ্ঠ তাদের অনেকেই মনে করেন রাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধারাটি যোগ করাই যথেষ্ট যে, রাষ্ট্রটি একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র'। কেউ কেউ একটি ধর্মীয় উজারত সৃষ্টি হলেই খুশী কিংবা একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেই যথেষ্ট-থাকুক না এর পাশাপাশি আর সকল উজারত এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয় যাদের সংগে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এইসব পণ্ডিত হয়তো মনে করেন, জীবনের কোন কোন দিক ইসলামের আওতার বাইরে পড়ে এবং কোন কোন দিক পড়ে এর আওতায়।

এই বিভাজনের ফল কী হয়েছে? একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে অর্পিত হয়েছে কিছু নিয়ম-কানুন এবং আনুষ্ঠানিকতা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব, যখন অন্য আর একটি শ্রেণী রাষ্ট্র এবং সরকার পরিচালনার সকল ব্যাপারে যা-ইচ্ছা তাই করার অবাধ লাইসেন্স ভোগ করে। এক শ্রেণী একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে জাগতিক সকল ব্যাপারে যখন আর-এক শ্রেণী ব্যস্ত থাকে পরবর্তী জীবন নিয়ে। এর পরিণাম হয়েছে মারাত্মক। সমাজের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীটি, যারা শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদপত্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে তারা নিজেদের আদর্শ এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিছু জানে না, অন্যদিকে জনতা এবং তথাকথিত ধর্মীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীটি তাদের চারপাশে যে সামাজিক শক্তিগুলো সক্রিয় রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীটি মনে করে, তারা উদার, প্রগতিশীল, তাদের দৃষ্টি সম্মুখ দিকে,- তাদের মুখে হরদম উচ্চারিত হয় তথাকথিত উদারনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিকদের কাছ থেকে ধার করা বস্তাপঁচা বুলি এবং শ্লোগান। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীটির শিকড় জনতার গভীরে মিলিত হলেও তারা ইসলামী আদর্শ ও তামাদ্দুনের বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর মুকাবিলায় থেকে যায় অক্ষম। ইসলাম কি এ ধরনের দ্বৈত ব্যবস্থা অনুমোদন করে? নিশ্চয়ই নয়। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং জনতা, এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্ব ও বিরোধিতা মুসলিম দেশসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের তাহজীব-তমুদ্দুনের পক্ষে একটা সত্যিকার বিপদ।

ইসলাম একটা উপাসনা পদ্ধতি নয়, কেবলমাত্র পরলোক চিন্তা ইসলামের দর্শন নয়-ভাবী-জীবনের চিন্তা-বিবর্জিত, ইহলোকসর্বস্ব কোন মতবাদ নয় ইসলাম। এটা একটি সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থা। জীবনের সকল দিক ও পর্যায় সম্বন্ধে ইসলামের ভাবনা-চিন্তা ও নির্দেশ আছে। জীবনকে পরস্পর বিচ্ছিন্নরূপে ইসলাম দেখে না, ভাবে না-খণ্ডতা ইসলামের লক্ষ নয়, সমগ্রই ইসলামের উদিষ্ট। তাই, একটি সুসমন্বত বিশ্ব দৃষ্টি এবং একটি সুষম, সুসামঞ্জস্য জীবন বিধানের সাথে সুসংগত ব্যক্তি-জীবন ও সমষ্টি-জীবন ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় তাই জ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগুলি স্বতন্ত্র নয় পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক নয়। বেশির ভাগ চক্ষু চিকিৎসকরা যেমন চোখের চশমা দিয়ে, দাঁতের ডাক্তার যেমন দাঁত তুলেই তার বিদ্যা স্থির করে, যেন চোখর সাথে, দাঁতের সাথে শরীরের কখনো সম্পর্ক নেই, ইসলাম সে রকম মনে করে না, গোটা দেহটাকে বিবেচনা করে জ্ঞানের কোনো শাখাকে অন্যান্য শাখা থেকে ইসলাম বিচ্ছিন্ন মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা গাছের শাখা-প্রশাখার মতোই, পত্রের মূল আছে কাণ্ড আছে, যা রস সিঞ্চন করে এবং ডালপালা এবং গাছকে ধরে রাখে।

স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী জীবনদৃষ্টি জ্ঞানের সকল ডাল-পালাকে মূলের ও কাণ্ডরে মতো সরস রাখে, নিবিড় ঐক্যে সংহত করে। এর ফলে ইসলামী শিক্ষা জীবন ও বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে একটা সমন্বিত বিশ্ব দৃষ্টি সৃষ্টি করে, খণ্ডভাবে, অর্থহীন বিচ্ছিন্ন একটি টুকরারূপে বিশ্বকে না দেখে, একে সামগ্রিকরূপে দেখবার ক্ষমতা দেয়। মানুষ যখন এই দৃষ্টি অর্জন করে তখন তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ঘটে তার অনিবার্য অভিব্যক্তি এবং তাতেই তার বিশেষ পরিবেশে, তার সংস্কৃতি ও তামাদ্দুনের প্যার্টান নিরূপিত হয়। আজ পর্যন্ত মানুষ যতো জ্ঞান অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু অর্জন করবে, সবকিছুরই চূড়ান্ত হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা শাসন বিবর্তনকর্তা। তিনিই মানুষকে শিখিয়েছেন, মানুষ যা জানতো না এবং জানে। তাঁর জ্ঞানেই বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত সমগ্র সৃষ্টি। কাজেই কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন, হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়, একই সূত্রে সমস্ত কিছু গাঁথা রয়েছে। ভুল-ভ্রান্তি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলছে মানুষ। তার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, পরস্পর বিপরীত ভাব-চিন্তা, ধারণা এবং ডাটা দ্বারা মানুষ বাঁচতে পারে না। এই বৈপরীত্য তাকে এক অন্তহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করে, এবং তার জীবনকে

করে তোলে একটা যন্ত্রণা-একটি অভিশাপ। এজন্য যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ আজ মরিয়া হয়ে সন্ধান করছে একটি সমন্বিত সামগ্রিক জীবন-দৃষ্টির। এই দৃষ্টি একটি মাত্র উপলব্ধি থেকেই আসে-তওহীদ অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা প্রতিপালক ও বিবর্তক হচ্ছেন আল্লাহ-এই উপলব্ধি, এই দর্শনই মানুষের মধ্যে উক্ত বাঞ্ছিত বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগীর জন্ম দেয়। মানুষের যখন এ সত্য দর্শন বা উপলব্ধি ঘটে, কেবল তখনি সে আবিষ্কার করে যে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও মানব জীবন একটি সমগ্র জিনিস, একটি অবিভাজ্য সত্তা। তার কাছে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব আর ধারণার বস্তু নয়, একটা বাস্তব সত্য যা দৃশ্য কিংবা দৃষ্ট বস্তুর মতোই প্রত্যক্ষ।

জ্ঞান অর্জনের উপর অমন চরম তাগিদ দিয়েই যে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওতের সূচনা হলো, এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, তাৎপর্যহীনও নয়। জ্ঞান তো মানুষের মনকে আলোকিত করে, তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে, তার মনকে, জীবন ও দৃষ্টির সত্যিকার অর্থ এবং তাৎপর্য আবিষ্কারের জন্যে তৈরী করে তোলে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই তার ইচ্ছা, অভিব্যক্তি ঘটছে। প্রকৃতিতে যে-সব নিয়মকানুন ক্রিয়াশীল রয়েছে সেগুলো সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। আল কুরআনে আমরা কী দেখি? ইহকাল-পরকালব্যাপী জীবনের সম্ভাবনা অধ্যয়নের জন্যে মানুষকে অপরিসীম জ্ঞান দিয়ে চলেছেন আল্লাহ। এর কারণ, জীবন ও বস্তু সম্বন্ধে ইসলামের মৌল ধারণা হচ্ছে - জীবন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ভূত কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশ বা টুকরা নয়। ইসলামী জীবন একটি সংগীতের মতো, জীবন যেন একটা অর্কেস্ট্রা, যাতে বহু যন্ত্র যুক্ত ও মিলিত হয় একটি মাত্র সুর সৃষ্টির জন্য।

গোটা জীবন এবং গোটা সৃষ্টি আল্লাহর নিয়মের দ্বারা শাসিত - তাই ইসলামে ধর্মীয় জীবন এবং ধর্ম-বহির্ভূত জীবন এ ধরনের চিন্তার কোন ঠাঁই নেই; ইসলাম জীবনকে এভাবে ভাগ করতে জানে না। গোটা সৃষ্টিকেই স্রষ্টা মানুষের সেবায় নিয়োজিত ও বশীভূত করে রেখেছেন। কিন্তু এ কথার অর্থ কি? সৃষ্টির উপর এ কর্তৃত্ব কেমন করে পায়? জবাব অতি সহজ। কেবলমাত্র জ্ঞানের বদৌলতেই মানুষ সৃষ্টিকে নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার মানসিকতা ও আত্মিক পূর্ণতা অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা এবং মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপই ইসলামের বৃত্তের মধ্যে পড়ে। এ কারণে ইসলাম বিজ্ঞান ও গবেষণাকে মানবিক মূল্যবোধ ও উচ্চতর আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন মনে করে না। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সাধনাকে ইসলামী জীবন দৃষ্টি কেবল প্রভাবিত করে না, নিয়ন্ত্রণও করে। এর ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা কখনো মহৎ লক্ষ-বর্জিত হয় না। ইসলামের সামনে রয়েছে কতগুলি সুনিশ্চিত প্রায়োরিটি, এই প্রায়োরিটিগুলো পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত বলে কোনটা আগে করতে হবে এবং কোনটা পরে করতে হবে, লক্ষ্যের দিক দিয়ে কার দাবী আগে, কার দাবী পরে, এ বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। মুসলিম দেশগুলোর সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইসলামের এই মূল্যগুলোর প্রতিফলনই মান কল্যাণের জন্য সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে তাদের ভূমিকা-পালনের মৌল উপায়। অধ্যয়ন ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন তথ্য এবং ডাটা হিসাবে গণ্য করা হলে তাতে শুধু বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হবে। গাছের শিকড় এবং কাণ্ড থেকে ডাল-পালা এবং পত্র-পুষ্পকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না তেমনি ইসলামের মৌল জীবন দর্শন থেকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখা-প্রশাখাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এবং মৌল জীবনদৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা যে শিক্ষার লক্ষ তা থেকে ফায়দার চেয়ে ক্ষতিই হয়, বহুল পরিমাণে বেশী।

> জ্ঞানের কোন শাখা-প্রশাখা কি সত্যিই ইসলাম বহির্ভূত? তা নয়, সবই ইসলামসম্মত, যদি সে-সবের চর্চা ও অনুশীলন করা হয় জীবন, বস্তু ও প্রকৃতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিকোণ মনোভংগি নিয়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোকে এটি ইসলামসম্মত, ইসলাম বহির্ভূত, ওটি ইসলাম বিরোধী, এ কথা বলা যায় না। কোনো শিক্ষা ইসলামসম্মত কি-না তার বিচার হবে দু'টি প্রশ্নে- এ শিক্ষার মূলে কোন জীবনদৃষ্টি বা দর্শন কাজ করছে এবং শিক্ষার লক্ষ্য কি? শিক্ষার পিছনে যদি ইসলামী জীবন-দৃষ্টি সক্রিয় থাকে তাহলে তার লক্ষ্য হবে জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে জানা এবং সৃষ্টির কল্যাণে জ্ঞানের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য ও জীবন-দৃষ্টি নিয়ে যে জ্ঞানের চর্চা এবং সাধনাই করা হোক তাই ইসলামসম্মত। এই যে দৃষ্টিভংগি একে সাধারণ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা-সহ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রসারিত করে জীবনকে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক দিক দিয়ে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য মুসলমানদেরকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের একটি মাত্র শিক্ষা-পদ্ধতি থাকতে পারে যা হবে নারী এবং পুরুষের উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে নারী এবং পুরুষের, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনের কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। এ ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা ত্বরিৎ বিপ্লব আনবে মুসলমানদের চিন্তা অনুভূতি এবং কর্মে যদি আমরা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে জাতীয় ভাষার পরম গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষম না হই। এজন্য প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে মুসলিম দেশগুলির জন্য নতুন শিক্ষা কারিকুলাম ও সিস্টেম প্রণয়ন অপরিহার্য।

এ ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতির ফল হবে বাঞ্ছিত প্রত্যেক মুসলিম দেশেই সৃষ্টি হবে এক দল কারিগর, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজকর্মী, মরমী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রনীতিবিদ-যারা জীবন ও প্রকৃতির দিকে তাকাবে প্রকৃত মোমেনদের চোখে নিরবিচ্ছন্নভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করে পাবে অনির্বচনীয় আনন্দ আর তাদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নূয়ে পড়ে বলবে 'হে রাব্বুল আলামীন, সমস্ত প্রশংসা তোমারই।'

সূত্রঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ২০০২, অধ্যাপক শাহেদ আলী সংখ্যা

শাহেদ আলী